

## বাঙালী চিত্রের নীরস বৈরাগ্যবিমুখতা

এই উদার মানবতারই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা, মানবদেহের প্রতি এবং দেহাশ্রয়ী কায়াসাধনার প্রতি অপরিমেয় অনুরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি সুনিবিড় আকর্ষণ, রূপ ও রসের প্রতি তাহার গভীর আসক্তি ।

সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুহূর্তের প্রতি বাঙালীর অনুরাগ ময়নামতী-পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পে, সদুক্তিকর্ণামৃত, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থের নানা বিচ্ছিন্ন শ্লোকে, চর্যাগীতির পদগুলিতে, এবং তাহার লোকাযত ধর্মকর্মের আচারানুষ্ঠানে বারবার অভিব্যক্ত। এই সুখ-দুঃখময় জীবনের প্রতি একটা গভীর আসক্তি প্রাচীন বাঙালীর প্রতিমাশিল্পের ও সাহিত্যের ইন্দ্রিয়স্পর্শালুতা এবং হৃদয়বেগের মধ্যেও ধরা না পড়িয়া পারে নাই। এই আসক্তি ও আবেগ হইতেই আসিয়াছে ঐহিক বস্তুনিষ্ঠা এবং নীরস বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা। প্রাচীন সাহিত্যের নানা স্থান হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি শ্লোকসাম্প্য নানাসূত্রে উল্লেখ করিয়াছি। যে-বৈরাগ্য দুঃখের আকর বলিয়া মানব সংসারের প্রতি মানুষের চিত্তকে বিমুখ করিয়া দেয়, মানবজীবনের বিচিত্রলীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে শেখায়, পঞ্চভূতনির্মিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়সমৃদ্ধ এই দেহকে ক্রেদকৃমিকীটের আবাস বলিয়া ঘৃণা করিতে এবং দেহকে নানা উপায়ে ক্লিষ্ট ও নির্যাতন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈরাগ্যের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ বাঙালীর নাই, আজও নাই, মধ্যযুগেও ছিল না, এবং যতদূর ধরিতে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালেও ছিল না। যাহার সৃষ্টির ধারা হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতার দিকে, নীরস বৈরাগ্যের প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ থাকিতে পারে না। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের স্থান যেন কোথাও নাই। বিশুদ্ধ স্ববিরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। দিগম্বর জৈনধর্মের কিছু প্রসার এদেশে ছিল বটে, কিন্তু খবুই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাঁহারা কখনও সাধারণভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা তো তাঁহাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপই করিয়াছেন! ব্রাহ্মণ্যধর্মী একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীরাও ছিলেন; তাঁহারাও যে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মহাযানী শ্রমণ ও আচার্যদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা তো নীরস বৈরাগী ছিলেন না, মানবজীবন ও মানবসংস্কারকে অস্বীকারও করিতেন না। নিজেরা সংসার জীবনযাপন তাঁহারা করিতেন না একথা সত্য, কিন্তু সমস্ত প্রাণী জগতের প্রতি তাঁহাদের করুণা এবং মৈত্রীভাবনা তাঁহাদের জীবন ও ধর্মসাধনাকে একটি অপূর্ব স্নিগ্ধ রসে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর, বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কালচক্রযানী এবং সহজযানীদের ধর্মসাধনার ভিত্তিতেই তো ছিল দেহযোগ বা কায়সাধনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যই হইতেছে এই দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়কুলকে আশ্রয় করিয়া দেহ-ভাবনার উর্ধ্বে উন্নীত হওয়া। নাথধর্ম, কাপালিকধর্ম, অবধূতমার্গ, বাউলমার্গ প্রভৃতি সমস্তই মোটামুটি একই ভাবকল্পনা ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহাদের সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নীরস, ইহবিমুখ আত্মনিপীড়নের বৈরাগ্য নয়; দেহবন্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ বা বৈরাগ্যসাধনা, ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, আসক্তির মধ্যেই নিরাসক্তির কামনা—দেহকে, ইহাসক্তিকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দূর সরিয়া গিয়াও নয়। জীবনরস রসিকের যে পরম বৈরাগ্য সেই রূপ ও রসসমৃদ্ধ বৈরাগ্য, গৃহীমনের পরম বৈরাগ্যই প্রাচীন বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল; সেই হেতুই বাংলাদেশে বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান-নাথধর্ম প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেইজন্যই বৈষ্ণব সহজিয়া সাধক-কবিদের ধর্ম, আউল-বাউলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত তন্ত্রধর্মের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাগ।

অরূপের ধ্যান ও বিশুদ্ধ বক্ষ্যা জ্ঞান-সাধনায় বাঙালীর অরুচি।

বেদান্ত চর্চায় বাঙালীর বিরাগ

বস্তুত অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল। বাঙালী তাঁহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে রূপে ও রসে মগ্নিত করিয়া; তাঁহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে ততটা নয় যতটা রূপের ও রসের পথে, অর্থাৎ বোধ ও অনুভবের

পথে। প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্পে, যে-সব ধর্মকে বাঙালী হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে সেই সব ধর্মের মধ্যে এবং যে-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই উক্তির প্রমাণ প্রত্যক্ষ। বাঙালীর ভক্তি যে জ্ঞানানুগ নয়, হৃদয়ানুগ, আবেগপ্রধান, তাহা সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কবির দেবস্তুতি রচনায়, তাহা সদুক্তিকর্ণামৃতই হউক, কবীশ্রবচনসমুচ্চয় বা প্রাকৃতপৈঙ্গলেই হোক, রাজকীয় লিপিমাল্যই হোক আর সাধনস্তোত্রই হোক। আর, প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিল্পের ইন্ড্রিয়ালতা এবং আবেগবাহুল্য তো একান্তই সুস্পষ্ট। সে-শিল্পসাধনা একান্তই রূপের ও রসের সাধনা। লোকায়ত ধর্মের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে; সে-ক্ষেত্রে তো অরূপ ও বিশুদ্ধজ্ঞান-সাধনার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আর, মহাযান হইতে বিবর্তিত যত ধর্মমত ও পথ তাহাদের সব ক'টির সাধনা তো একান্তই রূপ ও রসশ্রয়ী। এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, বিশুদ্ধ মহাযানী বিজ্ঞানবাদ বা মধ্যমক দর্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেই সব মত ও পথই চিন্তের নিকটতর করিয়া গ্রহণ করিয়াছে যাহার প্রধান আশ্রয় রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাবকল্পনার ধারা। ঠিক এই কারণেই বেদান্ত চর্চায় এবং বৈদান্তিক সাধনায় প্রাচীন বাঙালীর যেন অরুচি। ইহার অর্থ এ-নয় যে, বেদ-বেদান্তের চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে একেবারে ছিল না; ছিল বই কি, লিপিমাল্য কিছু কিছু প্রমাণও আছে। কিন্তু সে-চর্চা ও সাধনা বাংলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে নাই। বেদান্ত ও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের চর্চায় শুকশিষ্য, শঙ্করাচার্যের পরমগুরু গৌড়পাদ, ন্যায়কন্দলী রচয়িতা শ্রীধরভট্ট, উদয়ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত অল্পবিস্তর সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, গৌড়পাদকারিকা সাংখ্যকারিকা বা ন্যায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ করে নাই। ন্যায়কন্দলীর মত গ্রন্থের একটি টীকাও যে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তথ্যের ইঙ্গিত লক্ষণীয়। তাহা ছাড়া, প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আছে, দক্ষিণ-রাঢ়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ কাশীতে গিয়া সেখানে বেদান্তচর্চার বাহুল্য দেখিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপক বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধরা কী অপরাধ করিল! মীমাংসার চর্চাও বাংলাদেশে হইত; শ্রীধরভট্ট, উদয়ন, অনিরুদ্ধ, ভবদেব-ভট্ট, হলায়ুধ প্রভৃতির নাম তো ভারতপ্রসিদ্ধ। অনিরুদ্ধ ও ভবদেব দুইজনই কুমারিল ভট্টের মীমাংসা সম্বন্ধীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, মীমাংসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে বেশি রচিত হয় নাই; এবং গৌড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু শ্রীধরভট্টকেই চিহ্নিত করিয়া থাকুন আর গৌড়ীয় মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ সকল পণ্ডিতকেই বুঝাইয়া থাকুন, উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে বলিতেছেন, গৌড়মীমাংসক যথার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, এ-তথ্যের ইঙ্গিত একেবারে নিরর্থক নয়। বস্তুত, শুধু ধর্মসাধনায় নয়, ব্যাপকভাবে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ, যুক্তিধর্মী, বক্ষ্যা জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিত্তকে সমগ্রভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

বাঙালীর সৃজন প্রতিভার মূল উৎস। শক্তি ও দুর্বলতা

অথচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জ্ঞানের চর্চা করে নাই, বুদ্ধির অস্ত্রে শান দেয় নাই, একথাও সত্য নয়। মহাযান বৌদ্ধ ন্যায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ব্যাকরণ চর্চা, অভিধান চর্চা, চিকিৎসা বিদ্যা ও ধর্মশাস্ত্র চর্চা ও রচনায় সর্বভারতীয় বিদ্যার ভাণ্ডারে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মতো নয়। ন্যায়, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চা তো একান্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতার চর্চা এবং সেই ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তিও লাভ করিয়াছিল, যে-দীপ্তি ধরা পড়িয়াছে ন্যায়ের তর্কে, ধর্ম ও ব্যবহার

শাস্ত্রের যুক্তিতে, ব্যাকরণের ও অভিধানের নূতন ও মৌলিক সূত্র রচনায় । সে-দীপ্তিই দেখিতেছি মধ্যযুগে নব্যন্যায়ের চর্চায় এবং সাধারণভাবে বাঙালীর ন্যায় ও ব্যবহারকুশলতায় । কিন্তু আসল কথা হইতেছে, বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করে নাই । যেখানে জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়া নবতর গভীরতর জীবনসৃষ্টির আহ্বান সেখানে, অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্য-সাধনায়, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনায় সে মননের উপর নির্ভর করে নাই, বুদ্ধি ও যুক্তির নৌকায় ভর করে নাই । বরং সেখানে সে আশ্রয় করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সে যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বুদ্ধিকে তত উদ্ভিক্ত করে না যতটা স্পর্শ করে হৃদয়কে, প্রাণকে । এই প্রাণধর্ম, হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ালুতাই বাঙালীর সৃষ্টি-প্রতিভার মূল; ইহারাই তাহার শক্তি, ইহারাই আবার তাহার দুর্বলতাও ।